লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি

মাহবুব তালুকদার*

১। সংস্কৃতি কী?

১.১ সংস্কৃতির বহুবিধ সংজ্ঞা প্রচলিত রয়েছে। প্রতীচ্য-দেশে সংস্কৃতির নাকি একশ' ষাটটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। এদেশে সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'সংস্কৃতি-কথা' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, "সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; কাব্যপাঠের মারফতে, ফুলের ফোটায়, নদীর ধাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায় বাঁচা; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা, বিরহীর নয়নজলে, মহতের জীবনদানে বাঁচা; গল্পকাহিনীর মারফতে নর-নারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা; ভ্রমণ কাহিনীর মারফতে বিচিত্র-দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা(১)।"

১.২ আরেকটি ছোট সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁর ভাষায়, "দেশের লোকের যা-ই সংস্কার, তাই দেশের সংস্কৃতি(২)।"

১.৩ সংস্কৃতি বলতে সাধারণত দু'টি বিষয় বোঝায়। এক, বস্তুগত সংস্কৃতি, দুই, মানস-সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি যন্ত্রপাতি, আহার-বিহার, জীবনযাপন প্রণালী-এসব বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্গত। আর সাহিত্যে-দর্শনে, শিল্পে-সঙ্গীতে মানসিক প্রবৃত্তির যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাকে বলা যায় মানস-সংস্কৃতি। বস্তুগত ও মানস-সংস্কৃতি মিলিয়েই কোন দেশের বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে(৩)। বস্তুগত সংস্কৃতি দৃশ্যমান বিষয়, কিন্তু মানস-সংস্কৃতি বিমূর্ত।

---

* সদস্য পরিচালন পর্ষদ, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

(১) মোতাহের হোসেন চৌধুরী, 'সংস্কৃতি কথা, সমকাল প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৫ পৃঃ ১৬-১৭।

(২) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, 'একুশে ফেব্রুয়ারি, বক্তৃতামালায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্পর্কিত অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ, ১৯৭৬।

(৩) আনিসুজ্জামান, আমাদের সংস্কৃতি (প্রবন্ধ), দৈনিক ইত্তেফাক, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৮৫।

(৪) ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, বঙ্গসংস্কৃতি (প্রবন্ধ), 'বাংলাদেশ' গ্রন্থে সংকলিত, পৃঃ ১৮৪।

২। সংস্কৃতি ও জাতীয়তা

২.১ সংস্কৃতি ও জাতীয়তা দু'টি ভিন্ন বিষয়। জাতিসত্তা এবং জাতীয়তাও এক বিষয় নয়। জাতিসত্তা হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে আমাদের জাতিগত পরিচয়। অন্যদিকে জাতীয়তা বলতে নাগরিকত্বকে বোঝায়। এক সময়ে এদেশের মানুষ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অধিবাসী ছিল। পরবর্তীকালে তারা 'পাকিস্তানী' হয়। বর্তমানে আমরা 'বাংলাদেশী' হয়েছি। কিন্তু আমাদের জাতিসত্তার পরিচিতি 'বাঙ্গালী' আগের মতই রয়ে গেছে। ফলে জাতীয়তা ও জাতিসত্তাকে একত্র করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি যথার্থ কাজ নয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি বললে বাংলাদশীদের সাংস্কৃতিক পটভূমি না বুঝে আবহমান বাংলার প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালী জাতির সাংস্কৃতিক পটভূমিকে বুঝতে হবে।

২.২ সাংস্কৃতিক সীমানা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সীমানার আনুগত্য করে না বরং সে রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করে যায়। রাষ্ট্র-পরিচয় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিচয় রাতারাতি পাল্টায় না। একই সংস্কৃতির বিশাল সীমানায় নানা প্রয়োজনে মানুষ রাষ্ট্রীয় গণ্ডি টানে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, প্রাচীন গ্রীসে হেলেনীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল অসংখ্য রাষ্ট্র। সংস্কৃতি ও জাতীয়তার আলোচনায় এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

৩। বাংলাদেশের সংস্কৃতির উৎস ও বৈশিষ্ট্য

৩.১ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমির বৈশিষ্ট্য বিচিত্রমুখী। এ এলাকার আদি জনগোষ্ঠী ছিল প্রাক-আর্য জনসম্ভূত। পরবর্তীকালে আর্যদের প্রভাব পড়ায় আদি জনপ্রবাহের চিন্তা ও চেতনায় রূপান্তর ঘটে। মুসলমানদের এদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে তুরস্ক, আরব, ইরান ও মধ্য-এশিয়ার সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব পড়ে এখানকার মানুষের মধ্যে। পরবর্তীকালে ইংরেজ তথা ইউরোপীয়দের আগমনে একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক ফল্গুধারা বাংলার মাটি ও মানুষের জীবনে সঞ্চারিত হয়। এভাবে কালের বিবর্তনে নানা রূপ-রস নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে।

৩.২ এদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিচয় পেতে হলে বিদেশী ও বিজাতীয় মানুষদের শরণাপন্ন হতে হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুর কারণে প্রাচীন ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জীবনচর্চার পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা নিজেদের পরিচয় খুঁজে ফিরেছি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বাৎসায়নের কামসূত্রে, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, মুরারীর অনর্ঘ রাঘব গ্রন্থে, চালুক্যে, কালিদাসে, হিউয়েন সাং, মেগাস্থিনিস, ফাহিয়েন, বার্নিয়ের বর্ণনায়[৪]।

৩.৩ প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর জ্ঞানচর্চার পরিচয় গৌরবপূর্ণ। বাঙ্গালীর জ্ঞানস্পৃহা তখন থেকে চারদিকে সুখ্যাতি লাভ করেছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গগৌরব

শীলভদ্রের খ্যাতি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। তিব্বতীয় রাজার আমন্ত্রণে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে সুদূর তিব্বতে গিয়েছিলেন। গদাধর, মদন, রামচন্দ্র, কবি ভারতী, বাসব বিশ্বেশ্বর প্রমুখ বঙ্গসন্তান বিদেশে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ইতিহাস রেখে গেছেন। কহ্লান বলেছেন, বিদ্যাচর্চার জন্য বাঙ্গালী কাশ্মীর পর্যন্ত যেত।

৩.৪ বাঙ্গালীর আদি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় নবম শতাব্দীতে লেখা কর্পূরমঞ্জরীতে। তাতে বলা হয়েছে, হরিকেলের রমণীরা প্রাচ্যের সকল রমণীর তুলনায় সাহসী, চম্পা নগরীর চাঁপা ফুলের মত স্বর্ণের অলংকার তাদের পরিধানে, তারা রাধার মত আকর্ষণীয় এবং রূপঐশ্বর্যে কামরূপকে জয় করেছে। হরিকেলবাসীর কেলিতে এরা অংশ নিতেন। ধারণা করা হয়, এই হরিকেল বাংলাদেশের অংশ। আর্য সভ্যতার বাইরে থেকেও এদেশবাসী ঐশ্বর্যশালী রুচির অধিকারী ছিল বলে এ উক্তি থেকে অনুমান করা যায়।

৩.৫ এ সময়ে বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থা কী ছিল, তা জানা যায় 'সদুক্তিকর্ণামৃত' থেকে, যাতে গ্রামীণ মানুষের চরম দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। চর্যাপদগুলোর সমাজচিত্রের ভেতর বাঙ্গালী-জীবনের সাংস্কৃতিক স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। এসবের মধ্যে কাঁচা ও পোড়া মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি, মনসার পট তৈরি, কাঁথা সেলাই, হাড়ি-পাতিল চিত্রিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্প ও রুচির ধারণা পাওয়া যায়। 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থেও প্রাচীন সমাজের পরিচয় আছে।

৪। বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতি (পাল রাজত্ব থেকে তুর্কী বিজয়)

৪.১ আর্যপূর্ব বাংলাদেশে যেসব মানুষ বাস করত, তাদের মধ্যে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় ও নেগ্রিটো প্রধান। এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে। ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-গঠন ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে এদের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাই এখানে প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালের মানুষেরা গোত্রভুক্ত ছিল। ক্রমে একাধিক গোত্রের লোক সমতলভূমিতে চাষাবাদ করতে এসে ছোট ছোট কৌম সমাজ বা জনপদ গঠন করে। আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে কৌম সমাজ ও জনপদের যে নাম পাওয়া যায়, তা হচ্ছে— বঙ্গ, পুন্ড্র, সুহ্ম, বরেন্দ্র, গৌড়, সমতট, হরিকেল। শক্তিশালী কৌমপতির অধীনে একাধিক কৌমরাষ্ট্র মিলিত হয়ে বড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তখন কৌমপতি রাষ্ট্রপতিতে পরিণত হন। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে এবং কৃষিজাত পণ্যনির্ভর কুটিরশিল্পে তখনকার আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। এ সময়ের বিকাশমান সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় শাসক ও শোষিত শ্রেণীর চরিত্রের চাহিদা অনুযায়ী আবর্তিত হয়েছিল। সামন্ত-সমাজে ব্যক্তির অধিকার ছিল না। ধর্ম তখন একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজা বা পুরোহিত শ্রেণী ছিল সকল বিষয়-আশয়ের পরিনিয়ন্তা।

৪.২ আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। পাল বংশ চারশ' বছর রাজত্ব

করেছিল। পাল রাজাদের হাতে বাঙ্গালী প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং এ সময় থেকে বাংলায় সামগ্রিক ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধে ঐসময় থেকে এদেশের মানুষ উদ্দীপ্ত হয়। পাল রাজাদের আনুকূল্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদণ্ডপুরী ও সারনাথের বৌদ্ধ সংঘ ও মহাবিহারগুলো আশ্রয় করে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতে বাংলাদেশ গৌরবজনক আসন লাভ করে। বাংলার ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে চিহ্ন রয়েছে, তা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের আদি উৎস। উল্লেখ্য যে, পাহাড়পুর ও ময়নামতির স্থাপত্য শিল্পে লৌকিক জীবনধারার পরিচিতি বিধৃত।

৪.৩ সেন রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা বিস্তৃতি লাভ করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সামন্তশ্রেণী বৌদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত কিংবা রূপান্তরিত করে ফেলে। ফলে পাল যুগের অবসানে বাংলার জনসমাজে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বৃত্তিজীবী শ্রেণীভেদ, বর্ণবাদী শ্রেণীভেদে পরিবর্তন লাভ করে। সেন আমলে এক পরাক্রান্ত ও দুর্নীতিপূর্ণ সামন্ততন্ত্র তৎকালীন সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছিল। মানবিক সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তখন পূর্বের পরমতসহিষ্ণুতার বিলুপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

৫। মধ্যযুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (মুসলিম আমল)

৫.১ প্রাক্-মুসলিম যুগের পূর্ব-ভারতে কোন অখণ্ড আঞ্চলিক সত্তার বিকাশ ঘটেনি। তবে ঐ সময়ে বাঙ্গালী লোকগোষ্ঠী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো ক্রমাগত রূপ পাচ্ছিল। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি দিল্লীর রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে বাংলাকে মুক্তি প্রদান ও পূর্ব-ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন ছিল সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের অবিস্মরণীয় কীর্তি। ইলিয়াসশাহ, হোসেনশাহ প্রমুখ সুলতানগণ স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় নিজেদের স্থায়ী করার চেষ্টায় লিপ্ত হন। তৎকালে রাজস্বের উৎস নিয়ন্ত্রণকারী হিন্দু ভূস্বামীদের সাহায্যে তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করেন। বাংলাভাষী মুসলিম মধ্যবিত্তের জন্ম তখনও হয়নি। মুসলমানরা নিজেদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সমান্তরাল জীবনযাপন করত।

৫.২ মুসলমানদের আগমনের ফলে মধ্যযুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে মানবিক মূল্যবোধের নতুন ধারা সঞ্চারিত হয়। মুসলমান শাসকেরা এদেশে যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন পশ্চিম থেকে আগত পীর, ফকির ও দরবেশবৃন্দ। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদে নিমজ্জিত, বর্ণবাদে জর্জরিত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের সাম্যবাদের বাণী ও মানবিক মূল্যবোধ এক নতুন জীবনাচরণের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। মুসলিম শাসকগণ সামন্ত-প্রভুদের মত সর্বদা অবিবেচক ছিলেন না। তাঁরা মানবিক সম্পর্কের মূল্যবোধকে জাগ্রত করে রাজ্য শাসন করতেন। এই নতুন মানবতাবাদ শুধু মুসলিম সমাজে নয়, হিন্দু সমাজেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের ভাব-বিহ্বলতায় ভেসে গিয়েছিল সমগ্র বাংলাদেশ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' এই

মর্মবাণী প্রকাশের মধ্য দিয়ে চণ্ডীদাস এদেশে মানবিক সম্পর্ক, মানবিকতা, মানবতা ও মানবাধিকারের এক সম্মিলিত জয়গান উচ্চারণ করেছিলেন। ধর্ম নয়, রাষ্ট্র নয়, একমাত্র মানুষই সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে গৌরব ও মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের সংস্কৃতিতে মানবিক সম্পর্কের ফল্গুধারায় স্নাত হয়েছিল সেই সত্য।

৫.৩ মুসলিম শাসনামলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অসাধারণ বিকাশ ঘটে। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ছাড়াও মঙ্গলকাব্য, বৃহৎ পদাবলী প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হল মধ্যযুগের রোমান্টিক কাব্যাবলী, যাতে দেবতাকে অতিক্রম করে মানুষ সৃজনশীল সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে। চৈতন্যচরিতামৃত, পাঁচালী, ময়মনসিংহ গীতিকা, গাজীর গান, মনসার ভাসান এসময়ের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

৫.৪ মুসলমানদের এদেশে আগমনের পর ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি হল। তবে তা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে উদারনৈতিক ভাবধারা এবং পাল আমলের সহনশীলতাকে পুনরুদ্ধার করল। সুলতানদের উদারতা ও নিরপেক্ষতার জন্যই মধ্যযুগের সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। মধ্যযুগে মানবধর্ম তথা মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশই ছিল সংস্কৃতিচর্চার মূল কথা।

৬। আধুনিককালে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (ইংরেজ আমল)

৬.১ বাংলার ভাগ্যাকাশে বিদেশীদের মধ্যে পর্তুগীজ বণিকেরা উদিত হয়েছিল সবার প্রারম্ভে। পরবর্তী সময়ে একে একে এলো ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ। ইংরেজদের বাণিজ্যের অধিকার শাসনের অধিকারে গিয়ে পৌঁছল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "বণিকের মানদন্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"। হিন্দু সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে নতুন প্রভুর বন্দনায় আত্মনিয়োগ করলো আর পরাজিত মুসলমান অবক্ষয়িত সমাজ জীবনে অন্তরভরা ইংরেজ-বিদ্বেষ নিয়ে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করতে চাইল।

৬.২ নতুন রাষ্ট্রীয় শক্তির আবির্ভাবে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বদাই একটা আকস্মিক চাপের সৃষ্টি হয়। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও কৃষ্টির সহায়তায় এদেশে নতুন অভিজাত সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার পর গদ্য-সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে এলেন মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম প্রমুখ পণ্ডিত। অভিজাত হিন্দু পরিবারের সন্তানরা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর রাজভাষা ফারসি ত্যাগ করে নতুন রাজভাষা ইংরেজির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

৬.৩ ইংরেজদের আগমনে বাংলাদেশের মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন ভীষণভাবে মার খায়। হান্টার সাহেব ১৮৭১ সনে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে বলেছেন, "A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well-born

Musalman in Bengal to become poor; at present it is almost impossible for him to continue rich".(৫)

৬.৪ ইংরেজরা বাংলায় প্রভুত্ব বিস্তার করার পর অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের পর থেকে এদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলায় নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। এদের ঘিরে বাবু কালচার জন্মলাভ করে। সাতশ' বছরের প্রচলিত ফারসি ভাষার স্থানে ইংরেজি রাজভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক বৈষম্য চরমরূপ লাভ করে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রবাহ বাংলার সংস্কৃতির ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করলেও তা সর্বত্র নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি, বাংলার জনজীবনকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

৬.৫ ইংরেজ দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে মুসলিম অভিজাততন্ত্রের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, তার পরিণতি ছিল সুদূরপ্রসারী। মুসলমানরা পাশ্চাত্যভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল, আর অন্য দিকে হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে গড়ে উঠেছিল পেশাজীবী নগরনিবাসী মধ্যবিত্ত রূপে। ভাষার প্রশ্নে বিভ্রান্ত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ সেকালে ধীরে ধীরে পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে। এতে সামগ্রিকভাবে মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনে মার খায়।

৬.৬ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমন্বয় করে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে হিন্দু সমাজের একাংশকে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। ঐ সময়ে মুসলমানরা ওহাবী আন্দোলন ও ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অবকাঠামোকে নতুন রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছে। মুসলমানদের এসব আন্দোলন শুধু সংস্কার-মুখাপেক্ষী ছিল না, বৃহত্তর দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণে তা রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক মুক্তির আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তবে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার খাতিরে এ ধরনের আন্দোলন যথাযথ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিভাবে মুসলমানদের জীবনে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, হান্টারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে তা বিধৃত হয়েছে।

৭। সংস্কৃতির সংকট ঃ পাকিস্তানী আমল

৭.১ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই এদেশের মানুষের সত্তা দ্বৈত টানাপোড়নে আবর্তিত হতে থাকে। আমরা মুসলমান না বাঙ্গালী, এই অবান্তর প্রশ্নে জাতিসত্তাকে খন্ডিত করার প্রয়াস চলে। পাকিস্তানী ভাবধারাকে প্রথম থেকেই এদেশীয় মূল্যবোধের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। মুসলমানদের নবজাগ্রত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের জোয়ারে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক সত্তা প্রায় নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী। তারা ইসলাম ও

(৫) W. W. Hunter, 'The Imdian Musalmans', Published by W. Rahman, Bangladesh First Edition, June 1975. P-141.

জাতীয় সংহতির নামে বাঙ্গালীদের ওপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে, তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এদেশে তাদের তল্পিবাহকের অভাব কোনদিন হয়নি। তারা আরবি হরফে, রোমান হরফে কিংবা আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলা লেখায় উদ্যোগী হল। মূলত বাংলাভাষার ওপর আঘাত হেনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানকে তাবেদার ভূখন্ডে পরিণত করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য।

৭.২ বাংলাভাষাকে বিকৃত করার প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তানী সংস্কৃতির এদেশীয় ধারকবাহকদের মধ্যে। মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকায় বাংলাভাষা সম্পর্কে তৎকালে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়, তার নমুনাঃ "গোজাস্তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাঙলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসারভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, শৈশবে বাঙলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহ্দের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান-শওকাত হাসিল করেছিল। ... সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দুনের তায়াল্লুক বর্জিত বাঙলা ভাষা মাশরেকি পাকিস্তানের মাতৃভাষা নয়, এবং হবে না, হতে পারে না। একথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী[৬]।"

৭.৩ সরকারি উদ্যোগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করা হলেও, ততদিনে প্রগতিশীল ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা আত্মআবিষ্কারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মপরিচয় খুঁজতে গিয়ে তারা অসাম্প্রদায়িক দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যে লালিত হাজার বছরের আবহমান বাংলার জীবনায়নে নিজেদের প্রতিকৃতি দেখতে পায়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সরকারি সাহিত্য সম্মেলনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘোষণা করেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তারচেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো' টি নেই।"[৭]

৭.৪ ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হতে খুব বেশি দেরি হয়নি। ১৯৪৭ সালের মধ্যেই একটি সচেতন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সামন্তবাদী ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে প্রতিহত করা হল ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে। ভাষা, তথা সংস্কৃতির জন্য রক্ত দান পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। পরবর্তী সময়ে একুশে ফেব্রুয়ারির অমর আত্মদানকে সামনে রেখে এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশমান হয়।

---

[৬] সুকান্ত একাডেমী, 'ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি'-উদ্ধৃত, পৃ ঃ ৯৪।

[৭] পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮।

৮। বাংলাদেশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর

৮.১ ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, জীবনধর্মী, মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে জাগ্রত হয়। সাংস্কৃতিক আত্মানুসন্ধিৎসাই ধাপে ধাপে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পরিণতি লাভ করে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার গৌরবপূর্ণ দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না।

৮.২ কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতির রূপান্তর আজও কোন স্থিতি লাভ করেনি। ১৯৭৫ সনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন সংকট সূচিত হয়। ঐ সময়ের পর বিগত ২০ বছরেও এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয় নিরঙ্কুশভাবে বিঘোষিত হয়নি। সত্যি বলতে কি, আজ আমরা এক নতুন সাংস্কৃতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছি, যা নতুন প্রজন্মকে বহুধাবিভক্ত প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে।

৯. উপসংহার ঃ বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

৯.১ কোন রাষ্ট্র জনগণের চিন্তা ও চেতনার মৌলিক অভিব্যক্তিগুলো ধারণ করে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে জাতিসত্তার সুস্পষ্ট বিকাশ বাঞ্ছনীয়। জাতির মৌল নীতিতে নিজস্ব সত্তাকে বিভক্ত করা হলে তা আত্মঘাতী হতে বাধ্য। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিতর্কিত হলে তাতে একসময়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে উঠতে পারে। পাকিস্তানের পরিণতি আমাদের সামনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

৯.২ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের করাত দিয়ে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করলে সাংস্কৃতিক স্ববিরোধিতা আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানী আমলের মত দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হলে আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে আমরা পথ হারিয়ে ফেলব।

৯.৩ কোন জাতির পরিচয় চিরকাল এক জায়গায় থেমে থাকে না। তা সর্বদাই বিকাশমান। সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিচর্যা সেই পরিচয়ের সুস্থ বিকাশকে সহায়তা করে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির বর্তমান সীমাবদ্ধতা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। তবে যতদিন আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মধারা শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অঙ্গনে বাঁধা থাকবে, ততদিন আমাদের আত্মপরিচয় থাকবে খণ্ডিত[৮]। সাধারণ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে পারলে এদেশের মানুষের আত্মপরিচিতির সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাবে। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক চেতনার মুক্তি।

---

[৮] কবীর চৌধুরী 'বাঙালীর আত্ম পরিচয়ের সংকট' সুন্দরম, অগ্রহায়ন – মাঘ, ১৩৯৪।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসি'র বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ চর্চা মডিউলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ইসলাম, ডক্টর সিরাজুল, সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস),' এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

২। ইসলাম , মুস্তাফা নূরউল, সম্পাদিত 'বাংলাদেশঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে', সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০।

৩। চৌধুরী, কবীর, 'বাঙালীর আত্ম পরিচয়ের সংকট' সুন্দরম, অগ্রহায়ন-মাঘ, ১৩৯৪।

৪। চৌধুরী ,মোতাহের হোসেন, 'সংস্কৃতি -কথা', সমকাল প্রকাশনী, ১৩৬৫।

৫। মুসা , মনসুর, সম্পাদিত 'বাঙলাদেশ', নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪।

৬। রহিম, ডক্টর মুহম্মদ আবদুর, 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস', প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৭। রায়, শিবনারায়ণ , 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়,' দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১।

৮। শরীফ, আহমদ, 'গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা', আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯১।

৯। সুকান্ত একাডেমী, 'ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি', মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮ দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৫।

১০। হালদার, গোপাল , 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', মুক্তধারা, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ১৯৭৫।

১১। Hunter, W. W. 'The Indian Musalmans', Published by W. Rahman, Bangladesh First Edition, 1975.